দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... AUG. 17 1999
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ২ ...

প্রমথ চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল দিকপাল

ছিফাত রহমান সনম

"সবুজপত্রের" বিখ্যাত সম্পাদক, যিনি "বীরবল" এই ছদ্মনামের আড়ালে, আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন তিনি প্রমথ চৌধুরী।

১৮৬৮ সালের ৭ই আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর জীবনের সুন্দর সময়গুলো কেটেছে পাবনা জেলার চাটমোহর থানার হরিপুর গ্রামে। তাঁর পিতা দুর্গাদাশ চৌধুরী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। হরিপুর ছিল তাঁর পৈতৃক ভিটা।

বিষয়বস্তুতে প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ অভিমতের ধারক প্রমথ চৌধুরী কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, হেয়ার স্কুল, সেন্টজিয়ার কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও লন্ডনে পড়াশোনা করেন। প্রচন্ড বুদ্ধিমান, দর্শনের তুখোড় ছাত্র প্রমথ চৌধুরী বি এ দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং এম এ ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। আইনের উপর তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বার-এট-ল।

মুক্ত চিন্তার ধারক, জাগরণের মহাপ্রাণ প্রমথ চৌধুরী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন।

কর্মমুখর সময় কেটেছে তাঁর। সময়ের হাত ধরে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বহু সময় বহুবার। তিনি দীর্ঘ সময় কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দার্জিলিং কোর্টেও ব্যারিস্টার হিসেবে দক্ষতার সাথে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যাপনার সাথে জড়িত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর ও গোপাললাল শীল এস্টেটের রিসিভার এবং ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন।

জীবনে অনেক বই লিখেছেন। তাঁর রচিত ১৯১৭ সালে প্রকাশিত "বীরবলের হালখাতা" এখনও পাঠকমহলে প্রাণের সঞ্চার ঘটায়।

সম্ভবতঃ প্রমথ চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম "তেল-নুন-লকড়ি"। এটি সত্য যে প্রমথ চৌধুরী রচিত প্রবন্ধ ও গল্প ঠিক কতগুলো তার কোন সঠিক হিসেব নেই। অবশ্য কেউ কেউ "জয়দেব" নামক প্রবন্ধকেই প্রমথ চৌধুরীর প্রথম রচনা বলে থাকেন।

যৌবনের পূজারি, নাগরিকতার কথক, যুগধর্মের পতাকাবাহী প্রমথ চৌধুরীকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনেকেই ইংরেজি সাহিত্যের চেস্টারসন ও ফরাসি সাহিত্যের মর্তেয়ের সাথে তুলনা করেছেন। সমলোচকরা প্রমথ চৌধুরীকে তাঁর (প্রমথ চৌধুরী) ক্ষরধার বুদ্ধির চমকলীলা আর প্রখর চিন্তাশক্তি ও ইন্দ্রীয় ক্ষমতার জন্য এমন তুলনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

রস-ব্যঞ্জক ও কৌতুক রচনার জন্য অধিক পরিচিত ও প্রিয় পাত্র হয়েছিলেন নাগরিক সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী। ১৯৪৪ সালে তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ "Tales four friend" প্রকাশিত হয়।

বিবর্তনপন্থী প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করতেন যে, প্রবাহই হচ্ছে পবিত্রতা, স্রোতই শক্তি। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে, জীবন ও মনের সহজ গতি রোধ করে সমাজকে অটল করলেই তা অচল হয়ে পড়ে।

তিনি ছিলেন ভাবালুতাহীন, নির্বিকার, মননশীল, আত্মসচেতন। তিনি দেহের ও মনের যৌবনের পার্থক্য দেখিয়েছেন পাঠককে। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে সেই সমাজেরই যৌবন আছে বলে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। সাময়িক ব্যাপারকে কেবলমাত্র সাময়িক-ভাবে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না প্রমথ চৌধুরী। তিনি ঘটনার স্বরূপ উন্মোচন করতে চাইতেন। সত্যের ধারক "Crea-tive Evolution"- এ বিশ্বাসী প্রমথ চৌধুরী গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন সত্যের যুগ পেছনে পড়ে নেই, সম্মুখে গড়ে উঠছে।

কেউ কেউ আবার তাঁকে এ যুগের ভারতচন্দ্র বলেও উল্লেখ করেন। তিনি কখনও ব্যবহারিক জীবনকে শিল্পী জীবনের উপর প্রভুত্ব করতে দেননি। সর্বদাই নিজের ভাষাকে চৌকস ও চৌরস করতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, প্রাণের উত্তাপের চেয়ে বুদ্ধি ও কথার উত্তাপ অনেক বেশি।

সাধুভাষা সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। গোড়ার দিকে দু'একটি লেখা সাধু ভাষায় লিখলেও পরবর্তীকালে তাঁর যাবতীয় রচনা কলকাতার চলিত ভাষায় রচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো মুখের কথাই সাহিত্যের একমাত্র ভাষা হওয়া উচিত।

সাহিত্যের নামে ভন্ডামির কঠোর সমালোচক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন গলিত সমাজ ও সংস্কারের নির্মম শত্রু। যা স্থবির ও জরাজীর্ণ তাকে প্রবীণতার ছদ্মবেশে ঢেকে পূজা না করে প্রমথ চৌধুরী নিশ্ছিদ্র যুক্তির সাহায্যে সমাজ, সাহিত্য ও জাতীয় চরিত্রের জন্য যা মঙ্গলকার, তা গ্রহণ করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী বাঙালির অকালপক্ক প্রবীণতাকে ঘৃণা জানিয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, কবি ও ছোট গল্পকার। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক লাভ করেন প্রমথ চৌধুরী। তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও লেখাগুলো হলো 'সনেট পঞ্চাশৎ', 'ইয়ারী কথা', 'বীর বলের হালখাতা', 'নানা কথা', 'পদচারণ', 'আহুতি', 'আমাদের শিক্ষা', 'বীরবলের টিপ্পনী', 'দু-ইয়ারকি', 'রায়তের কথা', 'নানা চর্চা', 'নীল লোহিত', 'ঘরে বাইরে', 'নীল লোহিতের আদি প্রেম', 'ঘোষালের ত্রিকথা', 'অনুকথা সপ্তক', 'প্রাচীন হিন্দুস্থান', 'ট্রাজেডির সূত্রপাত', 'পদচারণা', 'আত্মকথা', 'সেকালের গল্প', 'গল্প সংগ্রহ', 'দুই না এক', 'বর্ষার কথা', 'নোবেল প্রাইজ', 'ফাল্গুন', 'পত্র- কৈফিয়ত', 'রাম ও শ্যাম', 'সহযাত্রী', 'অদৃষ্ট', 'পূজারবলী', 'মেরিক্রিশমাস' প্রভৃতি।

তাঁর লেখাগুলোতে বিভিন্ন রূপে নর-নারীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি সুন্দরভাবে। 'হীরার মতো চোখ বিশিষ্টা উন্মাদিনীর', 'সাপের মতো ফনা ধরা তস্করিণী', 'শিকার-চিতার মতো লিকলিকে ছলনাময়ী', 'রুদ্রপুরের রত্নময়ী, বড় বাবুর পাটেশ্বরী', 'শ্বেত পাথরে খোদা শ্রীমতী', 'চোখের মতো লম্বা দেহবিশিষ্টা ডানাকাটা পরী', 'LYDEN JAR' -এর মতো কিশোরী, 'অপ্সরোপম মুরাট সুন্দরী' ইত্যাদি।

নরদের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের। যেমন- 'নীল লোহিত', 'সিতিকণ্ঠ ঠাকুর', Night-এর মতো Mr day-এর মতো বড় সাহেব।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর কিছু ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়, যেমন তিনি বাঙালির মধ্যে জীবনের রং খুঁজেছেন (হালখাতা), বই দিয়ে ঘর সাজাতে চেয়েছেন (মলাট, সমালোচনা), অমাবস্যা রাতে বিদ্যুৎ দেখতে চেয়েছেন (খেয়াল খাতা), অপরূপ সজ্জিত বসন্তকে অভিনন্দন জানিয়েছেন (যৌবনে দাও রাজটিকা), চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে বইয়ের মলাট পছন্দ করেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর যদি কেউ শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তুলে থাকেন, তবে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী।

উদার ও সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী এই মহান ব্যক্তির মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল না। প্রমথ চৌধুরী বীরবলের হালখাতাতে লিখেছেন "ভগবান, আমার বিশ্বাস, মানুষকে চোখ দিয়েছেন চেয়ে দেখবার জন্য, তাতে ঠুলি পরাবার জন্য নয়"।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে কোন কোন ক্ষেত্রে সহানুভূতি আছে, আছে হৃদয়বোধের প্রকাশ- কিন্তু তাঁর প্রয়োগ সর্বত্রই শুদ্ধ ও সংযত। বুদ্ধির দ্বারা তাকে শোধন করে পরিমিত পরিমাণে প্রয়োগ করাই তার ধর্ম।

শুধু সবুজপত্রই নয়, প্রমথ চৌধুরী সম্পাদনা করেছেন "রূপ ও রীতি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, অলকা" প্রভৃতি নামের তৎকালীন জনপ্রিয় কিছু পত্রিকা।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য রচনাকে অকাজ হিসেবে নয়, নিয়েছিলেন সাধনা হিসেবে। মনে অনুভূতি থাকলে রচনা 'সরস' হতে পারে। কিন্তু চেষ্টা না থাকলে সুন্দর হয় না, এ কথা তিনি জানতেন। সাহিত্য বাগানে ফুল ফোটাতে গিয়ে অন্যমনস্কতা আর অবহেলা থাকলে চলবে না, থাকতে হবে স্বচ্ছন্দ সাধনা এটিই যেন গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী।

প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে মনন-সাধনার সূত্রপাত করেছেন, প্রবর্তন করে-ছেন অভিনব রচনারীতি। বস্তুত সমাজকে অচৈতন্য থেকে চৈতন্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম।

বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী প্রমথ চৌধুরী ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর (বাংলা ১৩৫৩ সালের ১৬ই ভাদ্র সোমবার) রাতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর চিন্তা, মনন ও প্রকাশভঙ্গির বক্রতা ও বৈদগ্ধ তাঁকে বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘজীবী করে রাখবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।